কায়কোবাদের কাব্যে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা

ফাতেমা কাওসার

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) নানা কারণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারায় অর্থনৈতিক-সমাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণেই বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যসাধনার শুরু অনেকটা বিলম্বিত। সেই বিলম্বিত সাহিত্যযাত্রায়, যাঁরা স্বতন্ত্র অভিনিবেশ সহকারে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে গদ্যে মীর মশাররফ হোসেন এবং কাব্যে কায়কোবাদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁরাই তাঁদের সমকালীন ও পরবর্তী কবি সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণার উৎস এবং পথিকৃৎ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কবি কায়কোবাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে 'আনন্দে লাফিয়ে উঠে' বলেছিলেন, "ইনিই মহাকবি কায়কোবাদ সাহেব? অমর কাব্য মহাশ্মশানের গ্রন্থকার? আমাদের সকলের গুরু"।[১] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কায়কোবাদের অবদান যে কতো অপরিসীম তা উপলব্ধির জন্যে নজরুলের এই আবেগময় শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ প্রতিভাবান অগ্রজ কবি কায়কোবাদের যথার্থ মূল্যায়ন উত্তরসূরি কবি কাজী নজরুল ইসলামের এ-বক্তব্যে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

বস্তুতঃ 'কায়কোবাদের মাধ্যমেই মুসলমানদের আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে হাতে-খড়ি হয়।'[২] বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টি যখন পুথি সাহিত্যের দিকে নিবদ্ধ ছিল সেই সময়ে শুদ্ধ ভাষায় আধুনিক বাংলা কবিতা রচনা করে সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন কবি কায়কোবাদ। পুথি সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে খাঁটি ও শুদ্ধ বাংলায় কাব্য চর্চা তখন কোন মুসলিম কবির পক্ষে ছিল রীতিমত দুরূহ ও অবিশ্বাস্য। কায়কোবাদ তাঁর হৃদয়ে এক গভীর বেদনাজাত দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে স্বজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই অবিশ্বাস্য অথচ প্রশংসনীয় কাজটি করেছিলেন। মূলতঃ কায়কোবাদই আধুনিক বাংলা কবিতার অঙ্গনে মুসলমান কবিদের শুভযাত্রার অগ্রপথিক। সে অর্থে কায়কোবাদ যথার্থ ভাবেই 'আমাদের সকলের গুরু।' 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম ধারার অন্যতম উদ্‌গাতা।'[৩]

কায়কোবাদের কবি-মানস উনিশ শতক ও বিশ শতক, এই দুই শতকের কাব্য ধারায় লালিত এবং তাঁর কাব্য সাধনাও এই দুই শতকে বিস্তৃত। কাব্যপ্রকরণে উনিশ শতকের আদর্শবাহী কবি ছিলেন তিনি। কিন্তু সাহিত্য ভাবনায় ও চিন্তা চেতনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার মানবিক ও আধুনিক। একটা উদার সম্প্রদায়নিরপেক্ষ মানবতাবাদী জীবনদৃষ্টি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। সমকালীন বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবন ও শিল্পবোধের পটভূমিতে কায়কোবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

কায়কোবাদ বলেছেন, 'কবিকে চিনিতে হইলে তাহার কাব্যের ভিতর দিয়াই তাহাকে চিনিতে হইবে।'[৪] কায়কোবাদের নিজের বেলায় তাঁর এ উক্তি একেবারে যথার্থ। কারণ কায়কোবাদের জীবনচৈতন্যের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে। ব্যক্তিজীবনে যে চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ ও নীতিকে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন কাব্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। 'স্বদেশপ্রীতির উপলব্ধি সে যুগের বাঙালীর জীবনে একটি নবলব্ধ অনুভব।'[৫] কায়কোবাদের মধ্যেও আমরা সে অনুভবের স্ফুরণ লক্ষ্য করি।

মানবতাবাদী কায়কোবাদ সারাজীবন নিজের দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবেসে গেছেন। তাঁর বিশ্বাস মানব-কল্যাণেই মানব জন্মের সার্থকতা নিহিত। পরোপকারকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজ বলে মনে করেন। মানুষ কর্তৃক মানুষের অপমান, নির্যাতন ও শোষণ তাঁর হৃদয়কে পীড়িত ও ব্যথিত করেছে। বস্তুতঃ মানুষের প্রতি ভালবাসাই কবিকে সমাজ-সচেতন করে তুলেছিল, নিজের দেশ ও জাতিকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল। কবির প্রার্থনা 'পারি যেন নাথ সাধিতে সংসারে জীবের মঙ্গল।'[৬]

স্বদেশ ও স্বজাতির জন্যে কায়কোবাদের মনে ছিল গভীর সহানুভূতি ও ভালবাসা। স্বজাতির মঙ্গল ও কল্যাণার্থে লেখনী ধারণ করেছিলেন তিনি। এবং সারা জীবন সে লক্ষ্যে ছিলেন পরিশ্রমী, সৎ এবং নিষ্ঠাবান। এক উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও চিন্তাচেতনা কায়কোবাদের কাব্যভাবনার মূল বৈশিষ্ট্য — যা তাঁর সমকালে অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। কায়কোবাদের এই উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার উৎসমূল অন্যত্র নিহিত। স্বদেশপ্রেম তথা মাতৃভূমি প্রীতি ছিল কায়কোবাদের হৃদয়মূলে প্রোথিত। নিজের দেশকে কবি অত্যন্ত ভালবাসতেন। সেই সঙ্গে ভালবাসতেন মাতৃভাষাকে। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার জন্যে তাঁর দরদ ও ভালবাসা অত্যন্ত তীব্র ও গভীর। এ ভালবাসাজাত চেতনা থেকেই তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি কামনা করেছেন সর্বদা।

কারণ কবি কায়কোবাদের দৃষ্টিতে মাতৃভূমি ভারত 'মা' এবং প্রধান দুই ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান মায়ের দুই সন্তান, পরস্পর ভাই ভাই। এই হিন্দু মুসলমান দুই ভাই এক হয়ে যদি কাজ করে তবে দুঃখিনী ভারতের উন্নতি হবে, দুঃখ দৈন্য ঘুচে যাবে—এই ছিল কবির বিশ্বাস। কবি তাদের আহ্বান করেছেন:

এস ভাই হিন্দু এস মুসলমান
　　আমরা দুভাই ভারত সন্তান
এস আজি সবে হয়ে একপ্রাণ
　　সেবি গে মায়ের চরণ দুটি।
　　　(হিন্দু-মুসলমান: *অমিয়ধারা* .পৃ, ১৭৩)

এ আহ্বানের পেছনে কবির যুক্তি,

এক বঙ্গ ভাষা আমাদের বুলি
মাও যে মোদের একই জন।
　　(হিন্দু-মুসলমান: *অমিয়ধারা*, পৃ. ১৭৩)

কবির বিশ্বাস, হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলেই বাঙালী জাতি। এবং এ জাতির মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা এক ও অভিন্ন। সুতরাং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার মঙ্গলের জন্যে দুই ভাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। তবেই দেশ ও জাতির উন্নতি সম্ভব। এই বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করে বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা রূপে পেয়ে কবি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কবির ভাষায়:

আমরা বাঙালী কি আছে জগতে আমাদের এই দেশের মত
ইন্দ্রের অমরা তুচ্ছ এর কাছে সৌন্দর্য তাহার নাহিক তত
বাঙালী বলিয়া দিতে পরিচয় গর্বে মোদের হৃদয় নাচে
আমাদের মত মাতৃভকত জগতের মাঝে কে আর আছে।
　　(বঙ্গভাষার কাব্যকুঞ্জঃ *অমিয়ধারা*, পৃ ১১৯)

এ আবেগময় সশ্রদ্ধ উচ্চারণ মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধ ও প্রচণ্ড ভালবাসার উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা দুটোই কবির কাছে মায়ের সম্মানে ভূষিত ও ভালবাসায় স্নাত।

'উনিশ শতকে মুসলিম বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ চেতনার মূলমন্ত্র আমরা কায়কোবাদের কাছ থেকেই প্রথম শুনতে পাই।'[৭] অত্যন্ত অল্প বয়সের রচনা 'কুসুম কানন' (১৮৭৩) থেকেই কায়কোবাদ-চৈতন্য স্বদেশ ভাবনায় বিচলিত। ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি তাকে ব্যথিত করেছে এবং ভারতবাসীর কাপুরুষতার জন্যে তিনি তাদেরকে ধিক্কার দিয়েছেন বারবার। 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে হিন্দু মুসলমানের মারাত্মক বিদ্বেষ প্রণোদিত অসহযোগী মনোবৃত্তি কিশোর কবিকে পরিণত দেশপ্রেমিকের মত বেদনাতুর করে তুলেছে।'[৮]

কুসুম কানন কাব্যগ্রন্থের 'জন্মভূমি দর্শনে' নামক প্রথম কবিতাটিই স্বদেশপ্রেমের অনুভূতিসিক্ত। জন্মভূমিকে তিনি 'সুখের সদন' নামে চিহ্নিত করেছেন এবং দেশের জন্য যে জীবন দেয় না তার মত পাতকী' জগতে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। 'ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে কোন এক বঙ্গ মহিলার বিলাপ' কবিতাটিও একই অনুভূতি প্রকাশক। এখানে তিনি ভারতকে 'অবলা দুঃখিনী ভারত জননি' বলে সম্বোধন করে বলেছেন, ভারতবাসী নিজেদের দোষেই সবকিছু

হারিয়ে এখন গলায় দাসত্ব শৃঙ্খল পড়েছে, 'স্বাধীনতা-সুখ-রতন' বেচে দিয়ে টাকার জন্য পরের পাদুকা বহন করছে। কবি ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, 'ধিক্‌রে বাঙালি পিশাচ কাঙালি/ এতই কি তোরা নির্লজ্জ অধম।' 'জাগরে' কবিতাটিতেও স্বদেশের প্রতি কবির ভালবাসার অনুরূপ প্রকাশ ঘটেছে। দীর্ঘ কবতাটিতে কবি একটি পাখীকে উদ্দেশ্য করে নিজের দেশের দুর্দশার কথা বলেছেন এবং পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহবান জানিয়েছেন:

জননীর দুঃখ নিরখি নয়নে
কিছুই কি যেদ নাহি হয় মনে?
কতকাল রবে ঘুমাইয়া আর
কতকাল সবে অধীনতা ভার?

অশ্রুমালা (১৮৯৬) কবির একটি উল্লেখযোগ্য খণ্ড কবিতার সংকলন। কাব্যটির মূল সুর প্রেম ও বিরহ। এ কাব্যের বেশ ক'টি কবিতাতেও কবির মাতৃভূমিপ্রীতির পরিচয় বিদ্যমান। 'জন্মভূমি', 'আগলা গ্রাম', 'ভিক্ষা' প্রভৃতি কবিতা তার মধ্যে অন্যতম। 'জন্মভূমি', 'আগলা গ্রাম' প্রভৃতি কবিতায় কবি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের জন্মভূমির বর্ণনা দিয়েছেন, শৈশবের স্মৃতিচারণা করে ফেলে-আসা দিনাগুলোর জন্যে আক্ষেপ করেছেন। 'ভিক্ষা' কবিতায় কবি নিপীড়িত ভারতবাসীর পক্ষ থেকে ভারত মাতার প্রতিনির্ধিত্ব করেছেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে বলেছেন, মনি কাঞ্চন কিছুই তার চাওয়ার নেই শুধু একমাত্র প্রার্থনা, 'আমার সন্তানগণ খেতে যেন পায়।' এ-প্রার্থনা মধ্যযুগের ঈশ্বরী পাটনীর বর প্রার্থনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বস্তুতঃ কায়কোবাদের কবি-প্রাণ স্বদেশ ও স্বজাতির ভাবনায় ছিল উদ্বেল। তাঁর অমর সৃষ্টি *মহাশ্মশান* (১৯০৫) সে ভাবনারই সার্থক রূপায়ণ। ভাতরবর্ষের ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ যেখানে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাই সংগ্রামে লিপ্ত, যার পরিণতি উভয় পক্ষের জন্যই করুণ ও মর্মান্তিক, হার জিত থাকলেও যে যুদ্ধে উভয় পক্ষ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত—সেই ঐতিহাসিক করুণ কাহিনীই কবির কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে। ভারত এবং ভারতবাসী উভযের জন্য কবির ভালবাসাই পক্ষপাতহীন ভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের বীরত্ব, অসহায়ত্ব ও দেশপ্রেমের গভীর আন্তরিকতার চিত্র চিত্রণে সক্ষম করে তুলেছে।

মহাশ্মাশান কাব্যে যুদ্ধরত দুই শক্তি হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষের বীর পুরুষ ও নারীরা দেশপ্রেমের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান। স্বদেশকে রক্ষার জন্যে কিংবা স্বদেশ উদ্ধারে তারা বদ্ধ পরিকর। তারা সকলেই স্বদেশকে জননীর মর্যাদা দান করে। স্বদেশের প্রয়োজনে প্রাণদান করতে তারা কেউ কুণ্ঠিত নয়। বীর পুরুষেরা স্বদেশের জন্য নিজের প্রেম ভালবাসাকে তুচ্ছ মনে করে। নারীরাও তাদের প্রিয়তমকে উৎসাহিত করে, উদ্দীপ্ত করে স্বদেশের তরে নিজেকে উৎসর্গ করার

কাজে। তারাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বদেশ উদ্ধার কাজে জড়িত। এমন কি একাব্যে সন্ন্যাসীরাও স্বদেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত। তারা মানুষকে সংগঠিত করে, উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়, নিজেরাও জীবন উৎসর্গ করার ব্রত গ্রহণ করে। অর্থাৎ উভয় পক্ষ এ যুদ্ধকে স্বদেশ-উদ্ধারের বা রক্ষার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে এবং এ কাজকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করে। অবশ্যই এ মনোভাব কায়কোবাদের নিজস্ব চেতনা-প্রসূত।

মহাশ্মশান কাব্যে সন্ন্যাসী মারাঠা বীরযোদ্ধাকে যুদ্ধযাত্রায় আশীর্বাদ করে এবং 'জন্মভূমি দুঃখিনী মায়েরে' উদ্ধারের আহ্বান জানায়। শুধু তাই নয়, সন্ন্যাসী নিজেও

জন্মভূমি জননীরে বিধর্মীর করে
উদ্ধারিতে আমিও এ ক্ষুদ্র প্রাণখানি
করিয়াছি নিয়োজিত জনমের মত।
(১ম খন্ড: ২২সর্গ পৃ. ৮৯)

লবঙ্গ-রত্নজী প্রেমিক জুটি সন্ন্যাসীর নির্দেশে স্বদেশের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের 'হস্ত কর্তন' করে দিতেও দ্বিধা করে না বরং দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, নিজেদের দুটি হাত তো অতি তুচ্ছ, স্বদেশের জন্য তারা নিজেদের জীবন দিতেও প্রস্তুত। (২ খণ্ড: ১৮ সর্গ: পৃ. ২৪৯)

কৌমুদী বাঈ তার প্রিয়তম বিশ্বনাথকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এভাবে:

জন্মভূমি জননীর সাধিতে কল্যাণ
মৃত্যু ত সামান্য কথা স্বর্গের সোপান
আমি যে অবলা নারী ঘৃণিত অধম,
নাহি শক্তি এ শরীরে আমিও এ প্রাণ
তুচ্ছ গনি প্রাণনাথ স্বদেশের তরে।
(২য় খণ্ড: ১ম সর্গ পৃ. ১৩৪)

কারণ 'স্বাধীনতা আশাতরু শৈশব জীবন থেকেই' তার 'হৃদয়ে অঙ্কুরিত।' এ আশা শুধুমাত্র কৌমুদী বাঈ এর নয় কায়কোবাদের নিজেরও। কবির নিজের অন্তরের আকাঙ্ক্ষাই তার সৃষ্ট চরিত্রের মুখে উচ্চারিত হয়েছে।

মারাঠা পক্ষের বীর শিবাজী, সদাশিব এরা প্রত্যেকেই স্বদেশ উদ্ধারে মৃত্যুভয়হীন, মাতৃভূমিরূপ জননীর অশ্রুজলে তাদের হৃদয় বিচলিত। তারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, 'স্বদেশের, উদ্ধারের তরে/ মৃত্যু বীরের পক্ষে স্বর্গের সোপান' (২খণ্ড: ৭ম সর্গ পৃ. ১৬৭)। একই অনুভূতিজাত উচ্চারণ মুসলিম পক্ষের বীর সৈনিকদের মুখে শোনা যায়। আহমদ শাহ্ আব্দালী 'স্বদেশ-স্বজাতি-স্বধর্মের' জন্য বীরবেশে প্রাণ দেওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। বীর নারী জোহরা স্বামীর পাপ স্খলনের জন্য স্বদেশের তরে যুদ্ধ করে। বীর পুরুষ নজীবউদ্দৌলার উদ্দেশ্যে বলে—

খোল অসি রণস্থলে হও আগুয়ান
স্বধর্মের স্বজাতির স্বদেশের হিতে
দেও হৃদয়ের রক্ত কর প্রাণদান।
(১ খণ্ড: ১৯ সর্গ পৃ. ৬২)

শুধু নজীবউদ্দৌলা নয়, আতা খাঁকেও জোহরা সম্মুখ সমরে উদ্দীপনা যোগায়। তার মতে, নারী শুধু ভোগ বিলাসের বস্তু নয়। তারাও দেশ ও জাতির জন্য কিছু করতে পারে। সুজা-পত্নী সেলিনা স্বদেশের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। তাঁর মতে, 'স্বজাতি, স্বধর্ম আর মাতৃভূমি সম কি আছে জগতে?' (২খণ্ড: ৫ সর্গ: পৃ. ১৫৪)

আতা খাঁ-হিরণ বালার প্রেম আতা খাঁর স্বদেশ প্রেমের কাছে শেষ মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে যায়, 'ব্যক্তিপ্রেম দেশপ্রেমে ঢাকা'[৯] পড়ে যায়। প্রাণপ্রিয় হিরণের কাছে আতা খাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি:

আজি আমি সব ছেড়ে এসেছি ছুটিয়া
রণক্ষেত্রে জন্মভূমি জননীর ডাকে।
(২ খণ্ড: ২৪ সর্গ পৃ. ২৮৪)

এবং সেই সাথে স্বদেশের জন্য মৃত্যুর অঙ্গীকার:

মৃত্যুকে বরণ করে লইয়াছি প্রিয়ে
স্বধর্ম ও জন্মভূমি জননীর লাগি।
(২ খণ্ড: ১৯ সর্গ: পৃ. ২৫২)

আতা খাঁর জীবন শেষ পর্যন্ত উৎসর্গিত হয় স্বদেশের জন্য। *মহাশ্মশানে*র প্রায় প্রতিটি চরিত্র দেশপ্রেমে উজ্জ্বল ও নিবেদিত প্রাণ।

অমিয়ধারা (১৯২৩) কাব্যে কায়কোবাদের স্বদেশপ্রেম-চেতনা অনেক বেশী গভীর ও আন্তরিক। কবি নিজের দেশ ও নিজের ভাষাকে যে কত ভালবাসতেন এ কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় তার সে অনুভূতির সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। মায়ের ডালা, আমার পল্লীখানি, দেশের বাণী, বঙ্গভাষার কাব্যকুঞ্জ, বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা, বাংলা আমার, আমাদের গ্রাম প্রভৃতি কবিতার নামকরণেই তাঁর সে হৃদয়াবেগের প্রকাশ পেয়েছে। 'মায়ের ডালা' কবিতায় কবি সমস্ত বঙ্গবাসিকে আহ্বান জানিয়েছেন 'সাহিত্যের কুঞ্জবনে' এসে 'কবিত্বের' 'ফুল রতনে' মালা গেঁথে মা-রূপ বঙ্গভাষার গলায় গেঁথে দেয়ার জন্যে। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা কবির কাছে মা, উভয়কে নিয়েই তিনি সমানভাবে গর্বিত, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা উভয়ের প্রতি কবির ভালবাসা অতুলনীয়।

পরাধীনতার গ্লানি কায়কোবাদের মনে তীব্র দহন ও বেদনার সৃষ্টি করেছে। এ যন্ত্রণায় কবির অন্তর অত্যন্ত পীড়িত। কবি বলছেন:

পরাধীন জাতি মোরা
হাত ভাঙ্গা পাও খোঁড়া

হাটিতে শকতি নাই কেমনে বা চলি।
(দেশের বাণী: *অমিয়ধারা:* পৃ. ১৪৮)।

অন্যত্র কবির উচ্চারণ:

আমরা ভিক্ষুক জাতি বেশ ভূষা শুতা লাথি
সয়ে সয়ে ফেটেছে উদর।
জানিনে সুখের লেশ সহি কত ক্ষুধা ক্লেশ
পরের পাদুকা বহি
শিরের উপর।
(কওসর: *অমিয়ধারা:* পৃ. ১০)

পরাধীনতার জ্বালা যে কবির অন্তরে কিরূপ মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে এসব উক্তি তারই পরিচয়বাহী। এ দেশের লোক শুধু বিলাস ব্যসনে রত, দেশের দুঃখ তাদের বোধগম্য নয়, এ দেশের ধান চাল সব বিদেশে চলে যায়, দেশ ভিক্ষুকের বেশে পড়ে থাকে- 'দেশের বাণী' কবিতায় কবি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এ চিত্র তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের দুঃখে ব্যথিত কবি আরও বলেছেন, যারা চাষা তারা মহাজনদের অত্যাচারে ছেলে-মেয়ে ও পরিবার নিয়ে কষ্ট করছে। অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষের কথা ভেবে কবির অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দেশের মানুষ বিদেশী বস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট বলে তাঁতী জোলারা অনাহারে মারা যায়। কবি আরও লক্ষ্য করেছেন, দেশের ভূস্বামী যারা তারা যমদূতের মত সর্বদা প্রজার রক্ত শোষণ করছে। অত্যাচারে অবিচারে সারা দেশ ছেয়ে গেছে অথচ দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য কেউ ভাবছে না দেখে কবির অন্তর হাহাকার করে ওঠে। 'বাংলা আমার' কবিতাটিও স্বদেশ প্রেম ভাবনায় অনন্য সুন্দর। কবিতাটির শুরুতে কবি বলেছেন:

বাঙ্গালা আমার আমি বাঙ্গালার
বাঙ্গালা আমার জন্মভূমি
গঙ্গা ও যমুনা পদ্মা ও মেঘনা
বহিছে যাহার চরণ চুমি।

এই বাংলার জন্য কবির হৃদয় সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকে। এই বাংলা কবির কাছে 'স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ' বলে বিবেচিত। নিজের দেশ ও দেশের অসহায় নির্যাতিত মানুষের মত কবি এদেশের প্রকৃতিকেও ভালবেসেছেন গভীর ভাবে। কবির দৃষ্টিতে তাঁর জন্মভূমির সৌন্দর্য বিচিত্র এবং অতুলনীয়। 'আমার পল্লীখানি' 'বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা' কবিতা দুটিতে জন্মভূমির অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা রয়েছে। কবির বর্ণনায় তাঁর মা-রূপ জন্মভূমির একটি সুন্দর চিত্রকল্প তৈরী হয়েছে:

আমার মায়ের আকাশ বাতাস
কতই সুধা ভরা
আমার মায়ের চরণ যুগল
যেন আলতা পরা।
(বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা: *অমিয়ধারা* পৃ. ১২৮)

কবি গভীর শান্তি ও সুখের আমেজে আপ্লুত হয়ে নিজের দেশের কথা বলেনঃ

এমন সুখের দেশ
নাহি কোন খানে!
দেখিলে জুড়ায় আঁখি গাছে গাছে ডাকে পাখি
সারি সারি শোভে তরী
তটিনী জীবনে।
(আমার পল্লীখানি: *অমিয়ধারা* পৃ. ১০৯)।

এই মাতৃভূমি বাংলার গাছ-পালা, ফল ফুল, মাঠ-ঘাট, নদী-পাখী সব কিছুকে কবি এমন ভালবেসেছেন যে মৃত্যুর পরও কবি এ দেশ ছেড়ে যেতে চান না। কবির মনে প্রশ্ন জাগে, মৃত্যুর পর যে দেশে যাবেন সেখানেও এই দেশের মত 'ফুল বাগানে কুসুম ভরা' 'চারিদিকে কানন ঘেরা' আছে কিনা। কবি প্রশ্ন করেন:

সেথাও কি ঐ নীল আকাশে
রবি শশী করে খেলা?
তৃণের কোলে মুক্তা দোলে
নিশি শেষের ভোরের বেলা?

বর্ষকালে বাদল ঝরে
ডাহুক ডাকে বিলের মাঝে?
হাসনা হেনার গন্ধ এসে
আকুল করে নীরব সাঁঝে?
(পরপারের যাত্রী: *অমিয়ধারা* পৃ. ২৫)

স্বদেশপ্রেমচেতনা কায়কোবাদ-কাব্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 'সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মূল সুর অনুসন্ধান কররে দেখা যাবে-- স্বদেশ প্রেমই একমাত্র বক্তব্য যা প্রতিভাবান কিংবা স্বল্পমেধাসম্পন্ন সব স্রষ্টাকেই আন্দোলিত করেছে।'[১০] সেক্ষেত্রে কায়কোবাদের মত প্রতিভাবান কবি পরাধীন দেশে বাস করে দেশের দুর্দশা ও হতাশা দেখে নিশ্চুপ নিরুদ্বেগ থাকবেন তা অকল্পনীয় ব্যাপার। বরং কায়কোবাদ লেখনী শুরুই করেছেন স্বদেশও স্বজাতির কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় এবং কাব্যজীবনের শুরু থেকেই তাঁর চৈতন্যে জাগ্রত রয়েছে স্বদেশভাবনা। নিজের দেশের সাধারণ মানুষ, কুলী, চাষী, তাঁতী, জোলা সবার জন্যে ছিল তাঁর অনেক ভালবাসা ও সহানুভূতি। নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের জন্যে তাঁর দরদী চিত্ত হাহাকার করে উঠেছে। পরাধীন দেশ ও জাতির জন্যে হতাশা, গ্লানি ও আক্ষেপে কবিপ্রাণ বার বার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। নির্জীব নিষ্ক্রিয় জাতিকে জেগে উঠার জন্যে, পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্যে তিনি বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। এ দেশ, এ দেশের প্রকৃতি, এ দেশের মানুষ, এ দেশের ভাষা কবির অত্যন্ত প্রিয়। আর এ প্রিয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে কবির উচ্চারণ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং আন্তরিক।

বিশেষ করে মাতৃভাষা সম্পর্কে কায়কোবাদ অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিধাহীন জোড়ালো কণ্ঠে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং

মাতৃভাষার প্রশস্তি গেয়েছেন। মাতৃভূমির মত আপন মাতৃভাষাও কবির কাছে মাতৃতুল্য। এ মাতৃভাষা নিয়ে তিনি যেমন গর্বিত তেমনি মাতৃভাষার রূপ-রীতি ও অবস্থান সম্পর্কেও তাঁর চিন্তা-ভাবনা প্রশংসনীয়। কায়কোবাদ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'বাঙলা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, জন্মভূমির ভাষা। ইহা হিন্দুরও ভাষা মুসলমানেরও ভাষা। ইহার উপর হিন্দু মুসলমান সকলের তুল্য অধিকার।'[১১] 'সে অধিকারের শক্তিতেই কায়কোবাদ এগুতে চেয়েছেন মাতৃভাষার স্বরূপ সন্ধানে এবং তার সহজ অনুশীলনে। দ্বিধামুক্ত অপরিসীম দরদ ছিল তাঁর এই মাতৃভাষার প্রতি। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নির্বিশেষে সে ভাষার উৎকর্ষ সাধনে তিনি ব্যাকুল ছিলেন। কি করে এদেশে আদর্শ বাংলা ভাষার একটি অখণ্ড কাঠামো নির্মাণ করা যায় সে চিন্তায় তিনি আত্মনিমগ্ন ছিলেন।'[১২]

এ কারণে তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে নিজেদের জাতীয় জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন, 'একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মাতৃভাষার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।'[১৩] তিনি বিশ্বাস করেন এ কাজে বাঙালী হিন্দু এবং বাঙালী মুসলমান উভয়ের দায়িত্ব এক এবং অভিন্ন। তিনি তাঁর কাব্যে বলেছেন--'

এসেছি আমরা মায়ের প্রাঙ্গনে ভাই ভাই মিলি হিন্দু মুসলমান
গাইতে মোদের জন্মভূমির মাতৃভাষার মঙ্গলগান।
(বঙ্গভাষার কাব্যকুঞ্জ: *অমিয়ধারা* পৃ. ১১৯)

কায়কোবাদের মতে, হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলে একই মাতৃভাষার চর্চার মাধ্যমে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা উভয়ের উন্নতি সাধন করবে। তাই তিনি বলেন, 'যাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য এক প্রকার বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য আর এক প্রকারের বাংলা ভাষার প্রচলন দেখিতে চান আমি তাহাদের কেহ নহি। আমি বাঙ্গালার হিন্দু এবং বাঙ্গালার মুসলমানের জন্য এক মিলিত ভাষা চাই।'[১৪] এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি 'মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাষা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি'।[১৫] আপন বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে। সমকালে অন্যান্য মুসলমানের রচনায় আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গেলেও কায়কোবাদ সচেতন ভাবেই তা পরিহার করেছেন। কারণ বাংলা ভাষায় প্রচুর আরবী ফারসী শব্দের প্রচলন ঘটিয়ে তিনি 'বঙ্গভাষাকে অস্বাভাবিক' করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেছেন, 'বাঙ্গালা ভাষার গতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সাহিত্যের দিক দিয়া সকল প্রকার সাধনা করিতে হইবে।'[১৬] তাই 'তিনি অলৌকিক ও কাল্পনিক কাহিনী নির্ভর পুথি সাহিত্যকে সুন্দরভাবে বর্জন করেছেন এবং বাংলা ভাষার স্বাভাবিক গতিধারায় আরবী ফারসী ও উর্দ্দু ভাষার অনধিকার প্রবেশকে মেনে নিতে পারেন নি।'[১৭] বরং তিনি বাংলা ভাষার সহজ সরল বোধগম্য রূপ গঠনে বিশ্বাসী ছিলেন।

আমরা জানি, কায়কোবাদ মারা যান ১৯৫১ সালের ২১ শে জুলাই। ভাষা আন্দোলনের সামান্য কিছু পূর্বে। বাঙালীর এ মহান আন্দোলন কায়কোবাদ দেখে

যান নি। কিন্তু এ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিল বহু পূর্ব থেকেই, কায়কোবাদ তখনও জীবিত। সে সময় মাতৃভাষার প্রতি দরদী কায়কোবাদ যে নিশ্চুপ ছিলেন না তা তাঁর অভিমত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। বরং কায়কোবাদ বাঙ্গালীর মাতৃভাষা কি হবে বা কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত রেখেছেন। তিনি দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, 'প্রকৃতির নিয়মকে উল্টাইয়া দিয়া উর্দু কোনরূপেই বাঙ্গালার মুসলিম জনসাধারণের ভাষা হইতে পারিবে না।'[১৮] তিনি আরও বলেছেন, 'বাঙ্গলাদেশ যে আমাদের মাতৃভূমি এ বিষয়ে বোধ করি এখন আর কোন শিক্ষিত মুসলমানের সংশয় নাই। এই মাতৃভূমির ভাষা হইবে এক ও অখণ্ডিত। ইহাকে যাঁহারা খণ্ডিত করিতে চান আমি তাহাদের রুচির ও দেশপ্রেমের প্রশংসা করিতে পারি না।'[১৯] 'মাতৃভাষার পরিবর্তন প্রয়াসী মুষ্টিমেয়'কে তিনি 'ভাববিলাসী' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত ভাষায় উচ্চারণ করেছেন, 'আমার মায়ের যে ভাষা, যে ভাষায় আমি প্রথম কথা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষা আমি সকল প্রাণমন দিয়া শিক্ষা করিয়াছি, যে ভাষায় আমি গল্প করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি-বন্ধু বান্ধবের সহিত মন খুলিয়া নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়াছি-গীত গাহিয়াছি, কবিতা লিখিয়াছি, সেই অমৃতোপম ভাষা আমার মাতৃভাষা না হইয়া বাংলার বাহিরের একটি ভাষা যে কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইতে পারে তাহা আমি বুঝিতে পারি না।'[২০]

একই আবেগে কবি তাঁর কাব্যে বলেছেন,

বাঙ্গলা মোদের মাতৃভাষা
কি আছে তাহার মত
শব্দে ছন্দে মুক্তো ঝরে
জাগায় প্রাণে স্বপ্ন কত!
উর্দু বল পার্সি বল
সব ভাষা মোর মায়ের পাছে!
আমার মায়ের মত এতই মধুর
কোন্ ভাষা আর ধরায় আছে।
(মায়ের জালা: *অমিয়ধারা:* পৃ. ১০৪)

তিনি আরও বলেছেন,

বাংলার কাব্য বাংলার ভাষা
মিটায় আমার প্রাণের পিপাসা
সে দেশ আমার নয় গো আপন
যে দেশে বাঙ্গালী নাই।
বাঙ্গালীর সনে মিশি প্রাণে প্রাণে
থাকিব সতত জীবনে মরণে
বাঙ্গালী আমার আপনার জন
'বাঙ্গালী আমার ভাই!
(বাংলা আমার: *অমিয়ধারা* পৃ. ১৩৯)

কবির এই দেশপ্রেম ও মাতৃভাষাপ্রীতি তাঁর কবি মানসের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য—যা অতুলনীয়। এই বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা কবির কাছে এত প্রিয় ও আদরের বস্তু যে, যারা দেশের বাইরে গিয়ে নিজের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে ভুলে যায় কবি তাদরেকে ধিক্কার দিয়েছেন। *শ্মশান-ভস্ম* কাব্যে কবির সৃষ্ট চরিত্র হেমলতা বলছে,

কেননা বাঙ্গালী বহু বিলাতে যাইয়া
নিয়া আসে সঙ্গে করি মেম একজন
আসা কালে বলিতে কি বাঙ্গালী হইয়া
স্বর্গাপেক্ষা প্রিয়তম জনমভূমির
মাতৃভাষা বাঙ্গালাও ভুলে গিয়া তারা
ইংরাজের পুত্র বলে দেয় পরিচয়
দেশে আসি ছি-ছি-ছি-ছি বাঙ্গালী জন্মের
সার্থকতা এই খানে ভেবে দেখ মনে
জগতের কোন জাতি কুকার্য্য এমন
করে কি?

(১১ সর্গ : পৃ ৬১)

হেমলতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা,

কিন্তু জীবনে কখন
ভুলি নেই মাতৃভাষা -ভুলিব না কভু।
মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে করে অনাদর
অপর ভাষাকে কভু দিব না প্রাধান্য
জীবনে, কেন না আমি বাঙ্গালরি মেয়ে
প্রিয়তম, ইহাই যে গৌরব আমার।

(১১ সর্গ: পৃ. ৬২)

স্পষ্টতঃই এ দৃষ্টিভঙ্গি কবির নিজের। প্রকৃতপক্ষে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা কায়কোবাদরে কাছে এক মহান ঐশ্বর্য ও সম্পদতুল্য। দুটিই কবির দৃষ্টিতে সমান মর্যাদার ও সমান গুরুত্বের। উভয়ের মঙ্গল ও উন্নতির জন্যই কবিচিত্ত সমভাবে ব্যাকুল। কবির ভাবনায় তারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কায়কোবাদের স্বদেশ-ভাবনা তাই মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়, তেমনি মাতৃভাষার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়ও স্বদেশভাবনাযুক্ত। এই উভয় দিকেই কবিপ্রাণ সদা জাগ্রত। কবির পরম গৌরব ও গর্বের বিষয় এই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা। কবি তাই গভীর আবেগে বলেন,

হৃদয় আমার, বাংলা লাগি
যে দেশেই থাকি সদা থাকে জাগি
স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ সে আমার
বাংলা আমার অমিয়-ধারা।

(বাংলা আমার: *অমিয়ধারা,* পৃ. ১৩৮)

কিংবা,

বাংলাদেশের ধূলা বালি গুলি
ডাকে সদা মোরে আয় আয় বলি
বক্ষে থাকি তার কি শান্তি আমার
কত সুখ পাই আমি।
(ঐ: ঐ: পৃ.১৪০)

কায়কোবাদের সমগ্র হৃদয় জুড়ে এই বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার স্থান। কায়কোবাদ প্রেমিক কবি ও ভালবাসার কবি। আপন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার জন্যে তাঁর সে ভালবাসা অতুলনীয়। কাব্যে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মাত্র। কায়কোবাদ-কাব্যে তাই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাবিষয়ক ভাবনা বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত।

তথ্যনির্দেশ

১ খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন, *যুগস্রষ্টা নজরুল,* তৃতীয় সংস্করণ মে ১৯৭৮
২ আহমদ শরীফ, মহাকবি কায়কোবাদ, *মাসিক মোহাম্মদী* ২২ শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮ সাল পৃ. ৬৬৫
৩ প্রাগুক্ত
৪ কায়কোবাদ, *অশ্রুমালা,* ষষ্ঠ সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৩৬, পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৮০ পৃ. ২২৮
৫ অঞ্জলি কাঞ্জিলাল, *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম,* মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৯ পৃ. ১৯
৬ কায়কোবাদ, *অশ্রুমালা,* প্রার্থনা, প্রাগুক্ত পৃ. ৪
৭ দিলওয়ার হোসেন, কবি কায়কোবাদ ও তাঁর যুগচেতনা, *পাণ্ডুলিপি,* সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ১ম সংকলন, ১৩৭৬ পৃ. ১৬৯
৮ আসাদুজ্জামান, *কায়কোবাদ,* কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৭০ পৃ. ৩১
৯ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক,* বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৩৯১ পৃ. ২৬২
১০ অঞ্জলি কাঞ্জিলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১১ বঙ্গবাণী, ১১ই পৌষ ১৩৩৯, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৩২ পৃ. ৫
১২ দিলওয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
১৩ *বঙ্গবাণী,* প্রাগুক্ত
১৪ প্রাগুক্ত
১৫ দিলওয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত
১৬ *বঙ্গবাণী,* প্রাগুক্ত
১৭ দিলওয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
১৮ *বঙ্গবাণী,* প্রাগুক্ত
১৯ প্রাগুক্ত
২০ প্রাগুক্ত